রহস্য চতুষ্টয়

(প্রথম খণ্ড)

সুজিত বসাক

লিইবার ফিয়েরা

ভূমিকা

রহস্য রোমাঞ্চে প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন। এই আকর্ষণ এড়িয়ে চলতে পারেন এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। সেই কারণেই হয়তো সাহিত্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে রহস্য রোমাঞ্চ সাহিত্য। খুব ছোট থেকেই আমার মধ্যে তার দারুন প্রভাব পড়েছিল। দেশী বিদেশী গোয়েন্দা সাহিত্য গোগ্রাসে গিলতে গিলতে একদিন দেখলাম আমিও লিখতে শুরু করেছি। ছোট-বড় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে অসংখ্য রহস্য গল্প-উপন্যাস। তবে আমার কোনও মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল না। এল এফ বুকস সেই আক্ষেপ দূর করে বিভিন্ন পত্রিকায় আমার লেখা চারটি রহস্য উপন্যাস নিয়ে প্রকাশ করছে ‘ রহস্য চতুষ্টয় ’। এই রহস্য সংকলনটিতে কেন্দ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে রয়েছে দুজন। একজন শতরূপা মুখার্জি এবং অন্যজন রক্তিম বিশ্বাস। একজন গোয়েন্দার প্রধান হাতিয়ার হল তার ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা। লেখক নিজে নিজের সৃষ্ট চরিত্রের প্রশংসা করলে দৃষ্টিকটু লাগে, তাই সে দায়িত্ব আমি পাঠকদের উপরেই ছেড়ে দিতে চাই। তাঁদের ভাল লাগলে তবেই আমার সৃষ্টি সার্থক। রহস্য উপন্যাসের আর একটি মোক্ষম উপাদান হল সাসপেন্স-থ্রিল-টানটান উত্তেজনা। রহস্যের জট পাঠকের মস্তিষ্কের তন্ত্রে তন্ত্রে ছড়িয়ে দিয়ে আবার সেই জট সুকৌশলে ,সাসপেন্স বজায় রেখে গুটিয়ে তোলার দায়িত্ব লেখকের। এটাই একজন গোয়েন্দা লেখকের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। এখানে মুন্সিয়ানা দেখাতে না পারলে পুরো লেখাটাই জোলো হয়ে যায়। এই সংকলনের চারটি উপন্যাস ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং নতুন আঙ্গিকে লেখা। পরতে পরতে জমজমাট রহস্য আর সাসপেন্স যেমন অক্ষুন্ন তেমনি রোমহর্ষক ও রোমাঞ্চকর যবনিকাপাত ঘটেছে। এর জটিল কাহিনী, বিস্তার ও সমাধান কার কেমন লাগবে, কে জানে! কৃতজ্ঞতা জানাই এল এফ বুকসকে, আমাকে পাঠকের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

২১/০২/২০২২ **সুজিত বসাক**

অরিসংহার ১১
কুহেলী জালে ৬০
চোরা কুঠুরি ৮৬
রহস্য জালে দিনহাটা ১২২

অরিসংহার

এক

রামবিলাস কর চৌধুরী মালদা শহরের একটি পরিচিত নাম। একজন বড় মাপের শিল্পপতি ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে সবাই তাঁকে এক ডাকে চেনে। উঁচু নীচু প্রায় সব মহলেই তিনি জনপ্রিয়। তাঁর আভিজাত্যের কারণে সবাই যেমন তাঁকে সমীহ করে চলে তেমনই তাঁর উদারপন্থী মনোভাবের জন্য তাঁর প্রতিটি কর্মচারী তাঁকে মন থেকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। কারও বিপদে আপদে তিনি অকৃপণভাবে পাশে দাঁড়ান। শিল্প সাহিত্যেও তাঁর গভীর রসবোধ আছে। একসময় মন দিয়ে নাটক করতেন। কিন্তু পারিবারিক ও ব্যবসায়িক কারণে সেটা আর বেশি দূর এগোয়নি। পরবর্তীতে শিল্প সাহিত্যের অগ্রগতির জন্যে পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন অন্তর থেকে। তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ছিল, একটা শহর শিল্প সাহিত্য কৃষ্টিতে পিছিয়ে পড়লে তার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অগ্রগতি কখনওই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করতে পারে না।

এরকম একজন মানুষের রহস্যময় মৃত্যুতে মালদা শহর শোকস্তব্ধ। নিজের বাড়িতেই, নিজের ঘরেই তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। প্রথমে বাড়ির লোক দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে পরে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে। ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এসপি নীলাভ দত্ত নিজে গিয়ে স্পট সার্ভে

করে এসেছেন। বডি পোস্ট মর্টেম করার জন্য পাঠিয়ে লোকাল থানার আইসি সামিম কবীরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। প্রাথমিক ভাবে দু'জনেরই সিদ্ধান্ত, এটা সুইসাইডাল কেস।

ক'দিনের জন্য নর্থ বেঙ্গল ঘুরতে এসেছে শতরূপা। মালদা শহরে দীপুদার বাড়িতে একবার বুড়ি ছুঁয়ে, যাবার কথা শিলিগুড়ি। দীপুদার মা শতরূপার মাসি। মায়ের পিসতুতো বোন। শতরূপাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন পুলুমাসি। ছেলেবেলার সেসব স্মৃতি এখনও চোখের সামনে ভাসে। পুলুমাসির শরীর খারাপ শোনার পর মনটা ছটফট করছিল। এই সময় গ্যাংটক থেকে মিস্টার রাম থাপার ফোন, "জটিল কেস ম্যাডাম, আপনাকে একবার আসতেই হবে।"

রাম থাপা ফালতু কথার মানুষ নন। তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। তখনই মনে হয়েছিল, এই সুযোগে মালদা হয়ে পুলুমাসিকেও একবার দেখে যাওয়া যাবে। কিন্তু রামবিলাসের মৃত্যু সমস্ত হিসাব গোলমাল করে দিল।

দীপুদাদের দু'টো বাড়ি পরেই রামবিলাস কর চৌধুরীর বাড়ি। খবরটা কানে আসার পর শতরূপাও কৌতূহলবশত একবার গিয়েছিল ওই বাড়িতে। কিছুটা দূর থেকেই লাশটা দেখেছিল তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে। কেন যেন তার সিক্সথ সেন্স বারবার বলছিল, 'কুছ তো গড়বড় হ্যায়।' পুলিশ কাউকেই লাশের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিল না। এসপি নিজে তদারকি করছিলেন। শতরূপা আর কৌতূহল দেখায়নি। সব ব্যাপারে পুলিশের উপর নাক গলানো ঠিক নয়। তাছাড়া তার হাতে সময়ই বা কোথায়? কালকেই শিলিগুড়ি রওনা দিতে হবে। পরশু গ্যাংটক। রাম থাপা বারবার ফোন করে যাচ্ছেন। নিঃসন্দেহে ওঁর কেসটা জটিল, নইলে এত তাগাদা দিতেন না। যেমন চুপচাপ গিয়েছিল তেমনই চুপচাপ বেরিয়ে এসেছিল শতরূপা।

কিন্তু বাধ সাধল রামবিলাসের ছোট মেয়ে রিমঝিম। বছর কুড়ি বাইশের ঝকঝকে স্মার্ট তরুণী। সটান শতরূপার সামনে এসে বলল, "আমি তোমাকে চিনি দিদি। তোমার অনেক কেস হিস্ট্রি পড়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার বাবাকে খুন করা হয়েছে। তোমাকে সেই খুনিকে খুঁজে বের করে দিতে হবে দিদি।"

দীপুদা পাশেই বসেছিল। সে বলল, "একথা বলছিস কেন রিমঝিম?

তোর বাবার মতো মানুষকে খুন করবে কে?"

রিমঝিম বলল, "তুমি জান না দীপুদা... বাবার অনেক শত্রু। আমার কেন যেন মনে হত... এরকমই একটা কিছু ঘটতে চলেছে। সেই আশঙ্কাটাই সত্যি হয়ে গেল।"

দীপুদা হেসে বলল, "মনে হওয়া... আশঙ্কা... এসব কথা দিয়ে তো কোনও কিছু প্রমাণ হয় না। যেটুকু শুনলাম, তাতে পুলিশের ধারণা এটা সুইসাইড কেস। কার মনে কখন কী কাজ করে সেটা কিন্তু সে নিজেও কখনও কখনও বুঝে উঠতে পারে না। আমি সাইকোলজির অধ্যাপক জানি কোনও কোনও সময় এর কোনও ব্যাখ্যা থাকে না। বড় জটিল বিষয় এই মনস্তত্ত্ব।"

এবার শতরূপা বলল, "তুমি বলছিলে তোমার বাবার অনেক শত্রু তুমি তাদের চেনো? তোমার কথা যদি ঠিক হয় অর্থাৎ তোমার বাবা যদি খুন হয়ে থাকেন তাহলে প্রথমেই যেটা নোটিশ করার মতো বিষয় সেটা হল উনি কিন্তু বাড়িতেই খুন হয়েছেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় বাড়ির লোকই এর সঙ্গে জড়িত আছে। কারণ আপাতদৃষ্টিতে তোমাদের বাড়ি যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে বাইরের কোনও লোক ঢুকে খুন করে যাওয়া অসম্ভব। তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?"

রিমঝিম স্বতস্ফূর্তভাবে বলল, "অফকোর্স। আমার দু'জনকে সন্দেহ হয়। প্রথম জন, বীরুকাকু মানে বীরু পোদ্দার। দ্বিতীয় জন হল, মোসারফ হোসেন। যদিও মোসারফের সঙ্গে আমাদের বাড়ির প্রত্যক্ষ কোনও যোগ নেই, তবুও সন্দেহ হয়। লোকটা গুণ্ডা প্রকৃতির। বাবাকে কয়েকবার হুমকি টুমকিও দিয়েছে। ওর সঙ্গে বীরু কাকুর খুব খাতির।"

"বীরু পোদ্দার কে? তোমার কেমন কাকু?"

"আমার নিজের কাকু নন। বাবার দুঃসম্পর্কের ভাই। আমাদের বাড়িতেই থাকেন। বিয়ে থা করেননি। গ্যারেজ রুমের পাশের ঘরটাতে থাকেন। আমাদের রথবাড়ি মোড়ের নার্সিং হোমের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন।"

"এমনিতে লোকটা কেমন?"

"শান্তশিষ্ট। কারও সঙ্গে বেশি কথা বলেন না। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন ঘর বন্ধ করেই থাকেন। সবিতাদির মুখে শুনেছি, উনি তন্ত্র সাধনাও করেন। ওঁর খাটের তলায় মরা মানুষের করোটি আছে, সবিতাদি নিজের চোখে

কুহেলী জালে

গুরপ্রীত মিঠুনের বাবাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে তিনি অবাক হয়ে বললেন, "তুমি তো পাঞ্জাবি... এসব।"

গুরপ্রীত হেসে বলল, "আঙ্কেল পাঞ্জাবিরাও বড়দের এভাবেই সম্মান জানায়। এর পিছনে আরও একটা রহস্য আছে, আমার বাবা পাঞ্জাবি হলেও আমার মা বাঙালি। তাই তো বাংলা বলতে কোনও অসুবিধা হয় না। আমার মা আমাকে বাঙালি কালচারও শিখিয়েছেন।"

হো হো করে হেসে উঠলেন অনাদি সামন্ত। সজোরে গুরপ্রীতের পিঠে একটা চাপড় মেরে বললেন, "ছোকরা। প্রথমে একটু ধন্দেই পড়েছিলাম। একে পাঞ্জাবি, তায় বিদেশ থেকে আসছ। কে জানে, কীভাবে আপ্যায়ন করব।"

"আর কোনও হেজিটেশন আঙ্কেল?"

"আর আবার কীসের হেজিটেশন? কিন্তু তুমি যে বাংলা জানো সেটা তো মিঠুন একবারও জানায়নি!"

"আমিই ওকে সাসপেন্সটা রাখতে বলেছিলাম।"

"তা বেশ। ক'টা দিন এখানে আনন্দে কাটাও। আশাকরি আমাদের এই ছোট্ট শহর তোমার ভালই লাগবে।"

বাংলার প্রত্যন্ত মফসসল শহর, অদূরেই বাংলাদেশের সীমানা। এই শহরের ছেলে মিঠুন সামন্ত বিজ্ঞানে অসাধারণ রেজাল্ট করে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর কলকাতার পড়তে গেল। সেখান থেকে গবেষণার সুযোগ

পেয়ে পাড়ি দিল আমেরিকা। সেখানেই দেখা হয় ইতিহাসের ছাত্র গুরপ্রীত সিং-এর সঙ্গে। প্রথমে আলাপ, তারপরে বন্ধুত্ব। গুরপ্রীতের বাড়ি পাঞ্জাবের লুধিয়ানায়।

ওরা দু'জনেই তিন মাসের ছুটিতে দেশে এসেছে। দিল্লি বিমানবন্দরেই নেমন্তন্ন করেছিল মিঠুন। কিন্তু এই ক'দিনের ছুটিতে গুরপ্রীত যে এভাবে নেমন্তন্ন রক্ষা করবে ভাবতে পারেনি। মিঠুন ও ফোন করে জানানোর পরেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। মনে মনে খুব খুশি হল মিঠুন।

দুই

বাড়ির সবার সঙ্গে মিশে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না গুরপ্রীতের। ওর মধ্যে একটা শিশু বাস করে এবং সেই শিশুকে সবাই খুব সহজে ভালবেসে ফেলে সেটা ভাল করে জানে মিঠুন। তাই ওর এই ম্যাজিকে অবাক হল না। শুধু বলল, "তেরে অন্দর কেয়া হ্যায় ইয়ার, সারে দুনিয়া তেরা আপনে হো যাতে হ্যায়?"

মিঠুনের বাইকে দুই বন্ধু চষে ফেলল শহরটাকে। শুধু শহর কেন, শহরতলি এমনকী আশপাশের কয়েকটা গ্রামও।

গুরপ্রীত খুব খুশি হয়ে বলল, "বাংলার গ্রাম এত সুন্দর আছে, কোনওদিন ভাবিনি। এখানে আসাটা আমার সার্থক হল। বাংলার আকাশে-বাতাসে নাকি অদ্ভুত এক মিঠাস আছে শুনেছি, এবার সচমুচ দেখলাম।

মিঠুন ঠোঁট উলটে বলল, "কী জানি বাবা, অত মিঠাস কোথায় পেলি, আমাদের চোখে তো ধরা পড়ে না।"

"হিস্ট্রি বন্ধু হিস্ট্রি... ইতিহাস দেখার চোখ তৈরি করে। হিউম্যান লাইফ, সভ্যতা, মানবস্পন্দন... তোমার বিজ্ঞানে তো সেসব নেই। শুধু যন্ত্রপাতি, অঙ্ক আর কম্পিউটার।"

"ডোন্ট ইগনোর মাই সাবজেক্ট।"

"ওকে...ওকে আই অ্যাম সরি। জাস্ট জোকিং ম্যান।"

সেদিন বিকেলের টিফিনে লুচি আর জলপাই আলুর দম করেছিলেন মিঠুনের মা নিজের হাতে। এমনিতে উনি আর এখন রান্নাবান্না করেন না। আরথ্রাইটিসের পেশেন্ট, আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে রান্না করা শরীর পারমিট করে না। তবে গুরপ্রীতের আবদারে তিনি হার মেনেছেন। মিঠুন গল্পের

ছলে বলে ফেলেছিল, “মায়ের হাতের জলপাই আলুর দম আর লুচি খেলে জীবনে ভুলতে পারবি না।”

ব্যস, যাবে কোথায়! শুরু হয়ে গেল গুরপ্রীতের আবদার। এমন নাছোড় ছেলে জীবনে দেখেননি বাসবদত্তা। আবার খুশিও হলেন। এমন করে তো কেউ তাঁর কাছে কিছু চায় না। তাই সমস্ত শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দূরে সরিয়ে রেখে বহু বছর পর খুন্তি ধরলেন।

খাওয়ার পর তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে গুরপ্রীত বলল, “এ হুয়ি বাত। তোমার হাতে সত্যি জাদু আছে মা। মিঠুন একদম সচ বলেছিল।”

বাসবদত্তা ভীষণ খুশি হলেন। এরপর প্রতিদিনই কিছু না কিছু করে খাওয়াতে লাগলেন ওদের। মিথুন অবাক হয়ে বলল, “আরে ইয়ার, তুই তো জিনিয়াস আছিস।”

মিঠুনের বোন চিত্রা বলল, “আমরা বললে মা কখনওই এসব করত না। অল ক্রেডিট গোজ টু ইউ গুরপ্রীত ভাইয়া।”

তিন

মিঠুনদের একটা খামারবাড়ি আছে শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে পেটলা গ্রামে। নামটা শুনেই বলে উঠল গুরপ্রীত, “নাইস নেম। জায়গাটাও নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে।”

“গেলেই দেখতে পাবি।”

পেটলা পৌঁছে গুরপ্রীত আবেগ সামলাতে পারল না। শিশুর মতো আনন্দে মেতে উঠল। মিঠুন ওর কাণ্ড দেখে হাসতে লাগল।

গুরপ্রীত বলল, “পাঞ্জাবিরা দিলখোলা জাতি। আনন্দের কিছু দেখলে আমরা দু’হাত তুলে ‘বল্লে বল্লে’ শুরু করে দিই। তাতে তোরা যতই হাসিস।”

পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে মেঠো পথের ধারে মিঠুনদের খামারবাড়ি। চারপাশে দিগন্তবিস্তৃত ধানি জমি। এই মূহুর্তে সবুজ ধানের সমারোহ। একতলা বাংলোবাড়ির প্যাটার্নে তৈরি ঘর। সামনে পরিষ্কার মাঠের মতো। তারপরে সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু পাঁচিল। তার ওপাশে দু’চারটে বস্তি ঘর। এখানকার গ্রামীন মানুষদের বাস। খামারবাড়ি হলেও আধুনিক সমস্ত ব্যবস্থাই এখানে আছে।

একটা রাত এখানেই কাটাবে বলে দু’জনে ঠিক করল। ফ্রেশ হয়ে

চোরা কুঠুরি

মোস্তাফা রাজমিস্ত্রির কাজ করে। ভাদু তার জোগাড়ে। দু'জনে অনেক দিনের সঙ্গী। সুখ-দুঃখের সাথী। ফাঁকিবাজি কম বলে ওদের কাজের অভাব হয় না। লোকে ডেকে কাজ দেয়। তবে মোস্তাফা এখনও হেড মিস্ত্রি হতে পারেনি। আর এ লাইনে হেড মিস্ত্রি না হতে পারলে দু'হাতে রোজগার আসে না। হেড মিস্ত্রির অনেক রকম ফন্দি ফিকির থাকে। লেবার কমিশন, দোকান কমিশন... এরকম অনেক ব্যাপার আছে। তবে নিজস্ব একটু এলেম থাকতে হবে। কারণ, অনেকেই ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে হেড মিস্ত্রির ওপরেই বেশি ভরসা করে। এদের নাকি বিল্ডিং বানানোর বাস্তব জ্ঞান অনেক বেশি থাকে... অনেকের ধারণা। সে জ্ঞান অবশ্য মোস্তাফার একেবারে কম নেই। তা প্রায় কুড়ি বছর হতে চলল, সে এ লাইনে এসেছে।

বাপ কেয়ামত আলি জোগাড়ের কাজ করত। কিন্তু তার প্রবল ইচ্ছে ছিল ছেলে রাজমিস্ত্রি হোক। সেই মতো মোস্তাফাকে কালুমিস্ত্রির হাতে সঁপে দিয়েছিল। কালুকাকা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। নিজের বিদ্যের সবটুকুই ঢেলে দিয়েছিল মোস্তাফাকে। তবু বড় কাজে হাত দিতে কেমন ভয় ভয় করে মোস্তাফার। অনেকেই পরামর্শ দেয়, "এসব ছেড়ে কনট্রাক্টের কাজে নেমে পড়।" মোস্তাফাও জানে আজকাল ভাল মিস্ত্রি পেলে সবাই কনট্রাক্টে কাজ করায়। সেই হিসাবে মোস্তাফার কাজ পেতে কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু তবুও ভয় ছাড়ে না।

ছোট থেকে মুখচোরা সে, গণ্ডির মধ্যে থাকতেই ভালবাসে। এদিকে নিত্যদিনের অভাবটাও মাঝে মাঝে খুব কষ্ট দেয়। বৃদ্ধা মা, তিন-তিনটে ছেলেমেয়ে, বউ সব মিলিয়ে খরচের হার হু হু করে বাড়ছে। মোস্তাফা আর পেরে ওঠে না। মনে হয় সঙ্গে অন্য একটা কিছু করতে না পারলে কিছুতেই সামাল দিতে পারবে না। অভাবের দোসর অশান্তি। ধীরে ধীরে অশান্তির মাত্রাও বেড়ে চলেছে পরিবারে। বউ নাসমীনকে দোষ দেয় না মোস্তাফা। খরচের এই টগবগে ঘোড়াকে লাগাম দেওয়া কি সহজ কথা! টুকটাক ধার-দেনাও হয়ে যাচ্ছে আজকাল, যেটা একেবারেই পছন্দ নয় মোস্তাফার। মোস্তাফা জানে ঋণের চেয়ে সর্বনেশে জাল আর হয় না। মাকড়সার জালের মতো পেঁচিয়ে ধরে, আর বেরিয়ে আসা যায় না।

হঠাৎ একদিন হীরু ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে চন্দন দেখা করতে এল মোস্তাফার সঙ্গে। চন্দন বলল, "মোস্তাফাদা তোমাকে একটা গোপন কাজ করে দিতে হবে। তুমি বিশ্বস্ত লোক। তাই তোমাকেই বললাম। ভাল মজুরি পাবে। লোক জানাজানি চলবে না, ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। পারবে?"

মোস্তাফা একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, "কী কাজ?"

চন্দন বলল, "সে রকম কিছুই না, একটা চোরা কুঠুরি বানিয়ে দিতে হবে। তোমার কাছে জলভাত। ফিনিশিংটা তুমিই দিতে পারবে। বাইরে থেকে যেন কিছুই বোঝা না যায়।"

মোস্তাফা জানে চন্দন মোটেই সুবিধার ছেলে নয়। মাঝেমধ্যেই মারপিট গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে। বড়লোক বাপের বিগড়ানো ছেলে। ইদানীং একটু শান্ত। বাবা টাকাপয়সা দিয়ে কোথায় যেন ভর্তি করে দিয়েছে। হয়তো সেজন্য ওসব করার অবকাশ পায় না। তবে দূষিত রক্ত তো আছেই।

মোস্তাফা চুপ করে আছে দেখে চন্দন বলল, "দ্যাখো, জোরের কিছু নেই। কাজ করবে কি করবে না সেটা তোমার মর্জি। বাবা আরও দু'-একজনার নাম বলেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছে এ কাজে তুমিই পারফেক্ট।"

মোস্তাফা বলল, "কোথায় হবে জিনিসটা?"

"আমাদের বাড়িতেই। তবে কাজ করার আগে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে। কাজ শেষ করে পয়সা নেবে, ঠিক সেই সময় থেকেই ওই চোরা কুঠুরির কথা ভুলে যাবে। চিরতরে। কি, রাজি?"

মোস্তাফা হাসল, "কাজটা কেমন হবে, কীভাবে হবে, কী বিত্তান্ত... এসব